

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১ | প্রকাশ: দ্বিতীয় অর্ধশতাব্দী : জুলাই - অক্টোবর ২০০৫



বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Vol. 47 | No. 1 | 2005



Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আল-মু'আল্লাকাত' কাব্যমালায় নারী-চরিত্রের স্বরূপ

Volume	47
Issue	1
Year	2005
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাঃ মিজানুর রহমান
Published online	October 1, 2005
DOI	10.62328/sp.v47i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i1.7
Pages	113-130
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ || ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘আল-মু‘আল্লাকাত’ কাব্যমালায় নারী-চরিত্রের স্বরূপ মুহাঃ মিজানুর রহমান*

‘আল-মু‘আল্লাকাত’ কাব্যমালা প্রাচীন আরব সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের সুনিপুণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে আছে গোত্র-প্রশংসা, মরুচারী বিভিন্ন জীব-জন্তুর বিচিত্র জীবনধারা, শোকগাথা, লোক-কাহিনী, অতীত ইতিহাস, গৌরব, পরাক্রমশীলতা, বংশ তালিকা, শৌর্য-বীর্যের কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া, আতিথেয়তা, প্রেম, প্রিয়ার পরিত্যক্ত-ভিটা সর্বোপরি প্রাচীন আরবের নিত্যদিনের জীবন প্রবাহের সরস উপস্থাপন।^১ তবে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি যে দিক এ কাবীদা^২-গুলোকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তা হচ্ছে নারী চরিত্রের সফল চিত্রণ। নারীর রূপ, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতির বর্ণনা এগুলোকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও চিরন্তন করে রেখেছে। ১৮ শতকের শেষে (১৭৯৮-১৮৩০ খ্রি.) ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ করে ইংরেজি কবিতায় রোমান্টিসিজম^৩ নামে যে নতুন ধারার বিকাশ হয়েছিল সেই ধারাটির চিত্র আমরা দেখতে পাই বহু শতাব্দী পূর্বের প্রাচীন আরবি সাহিত্যে তথা ‘আল-মু‘আল্লাকাত’ কাব্যমালায়। যদিও ধারাটি সে সময় রোমান্টিক হিসেবে পরিচিত ছিল না তবুও রোমান্টিসিজমের সকল বৈশিষ্ট্য তাতে বিদ্যমান ছিল। রোমান্টিক কবি Wordsworth (১৭৭০-১৮৫০ খ্রি.), Coleridge (১৭৭২-১৮৩৪ খ্রি.), Byron (১৭৮৮-১৮২৪ খ্রি.), Shelley (১৭৯২-১৮২২ খ্রি.), Keats (১৭৯৫-১৮২১ খ্রি.), Southey (১৭৭৪-১৮৪৩ খ্রি.), Moore (১৭৭৯-১৮৫২ খ্রি.)- প্রমুখের মত মু‘আল্লাকাতের কবিরাও প্রকৃতি ও মানুষকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন। এ কবিরা কল্পনার তরীতে জীবন, যৌবন ও পারিপার্শ্বিকতাকে দেখেছিলেন। নারী-চরিত্র ও জীবনের ঘটনাবলিকে কল্পনার স্পর্শে অসাধারণ করে তুলেছিলেন। মনের আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনাকে রূপে, রসে ভরিয়ে রোমান্টিক সুর সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের কবিতায়। প্রথম প্রথম পাঠক সমাজের কাছে রোমান্টিক কবিতা যেমন দুর্বোধ্য ও অমার্জিত মনে হত^৪ তেমনি মু‘আল্লাকাহুলোর নারী-চরিত্রের উপস্থাপন প্রথমে অশালীন মনে হলেও রুচি বদলের ধারায় এবং সাহিত্য-মান বিচারে এ কবিতাগুলো আজ মর্যাদামণ্ডিত।

* লেকচারার, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মু'আল্লাকাতের প্রত্যেক কবিই তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে 'তাশবীব'^৬ রচনা করেছেন। নারীর অকৃত্রিম রূপটি তাঁরা অঙ্কন করেছেন উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে ; যেখানে আছে ভালবাসা, উচ্ছ্বাস, সুন্দর জীবন বিনির্মাণের স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। ইমরু'উল কায়েস (৫০০-৫৪০খ্রি.) 'উনাইযাহে নিয়ে, তারাফাহ ইব্ন 'আবদ (৫৪৩-৫৬৯ খ্রি.) খাওলাকে নিয়ে, যুহাইর ইব্ন আবী সুলমা (৫৩০-৬২৭ খ্রি.) উম্মু আওফা ও সালমাকে নিয়ে, লাবীদ ইব্ন রাবী'আহ (৫৬০-৬৬১খ্রি.) নাওয়ারকে নিয়ে, 'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (৫২৫-৬১৫) 'আবলা ও ইবনাতু মালেককে নিয়ে, 'আমর ইব্ন কুলসুম (মৃ. ৬০০খ্রি.) উম্মু 'আমরকে নিয়ে, হারিস ইব্ন হিল্লিয়াহ (মৃ. ৫৮০ খ্রি.) আসমাকে নিয়ে মু'আল্লাকাহ রচনা করেছেন।

এসব মু'আল্লাকায় তাঁরা তাঁদের প্রেম, বিরহ-বেদনা, অন্তর্দাহ, নিস্পৃহতা, বিরাগ, বিলাপ, গৃহ-কাতরতা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ, নির্জনতা, অতীত-মগ্নতা প্রভৃতিকে চমৎকারভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এর স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মু'আল্লাকাহ-গুলোর মধ্যে কবি ইমরু'উল কায়েস রচিত মু'আল্লাকাহ-টিই সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। এই গীতিকায় কবি তাঁর অভিসারের বেশ কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। যার মাধ্যমে কয়েকজন নারীর শৈল্পিক চিত্র ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। এ-বর্ণনা পাঠককে কখনো চকিত, কখনো বিমুগ্ধ, কখনো উৎফুল্ল এবং কখনো দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাসস্থান কবির বেদনা-বিধুর হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছে অতীত প্রেমের ব্যথিত স্মৃতি। যে রিক্ত স্মৃতি কবিকে টেনে নিয়ে গেছে তাঁর দুই প্রেয়সী উম্মু আল-হুয়াইরাহ এবং উম্মু আল-রাবাব-এর কাছে। উম্মু আল-হুয়াইরাহ ছিল হারিছ ইব্ন হাযীন ইব্ন যমযমের ভগিনী। তারা উভয়ে ছিল 'কুজা' গোত্রের রমণী।^৭ প্রেমিকা হিসেবে তারা ছিল দুর্লভ ; কবির প্রতি একান্তই উদাসীন। তাদের দৈহিক অবয়ব ও সম্মোহনী মূর্তি কবিকে অস্থির করেছে বার বার। কিন্তু বিরহই হয়ে উঠেছে কবির একমাত্র বিধিলিপি। স্মৃতিই এখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন :

যেই দাঁড়াতো, অঙ্গ তাদের ছড়িয়ে দিত কস্তুরী-বাস,
লবঙ্গ-বাস আনতো বয়ে যেমন ধারা ভোর-বাতাস।
নয়নে মোর নামতো বাদল সেই সখীদের প্রণয়-ব্যথায়,
ভাসিয়ে দিত বক্ষ আমার অসির পিধান প্রবল ধারায়।^৮

অবশ্য যে-নারীর উপস্থিতি কবির মু'আল্লাকাতে ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চাচাত বোন 'উনাইযাহ'।^৯ প্রেমিকা 'উনাইযাহ কেন্দ্রিক যে ঘটনা 'দারাতু-জুল-জুল' নামক মরুদ্যানে ঘটেছিল সেটিই মু'আল্লাকায় কবির মূল চালিকাশক্তি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ— একদা কবি-প্রেয়সী 'উনাইযাহ তার সহচরীদের 'নিয়ে বিহার করছিলো। কবি গোপনে তাদের অনুসরণ করলেন। 'দারাতু-জুল-জুল' নামক মরুদ্যানে এসে এক তরুলতাচ্ছাদিত সুন্দর সরোবর দেখে 'উনাইযা তার দলবলসহ গোসলের

জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরবের প্রাচীন রীতি অনুসারে তারা বিবসনা হয়ে সরোবরে জলকেলিতে মত্ত হলো। কবি সঙ্গোপনে তাদের সমস্ত বস্ত্র অপহরণ করে নিকটে আত্মগোপন করে তাদের ক্রীড়া-কৌতুক উপভোগ করতে লাগলেন। গোসল-শেষে পরিধেয় বস্ত্র না পেয়ে তারা যখন বিব্রত বোধ করছিল, তখন কবি আড়াল থেকে বের হয়ে এসে বললেন, তারা যেন বিবসনা অবস্থায় জল হতে উঠে তার কাছ থেকে স্ব-স্ব বস্ত্র নিয়ে নেয়। অগত্যা সবাই কবির শর্ত পূরণ করে তাদের পরিধেয় বস্ত্র ফিরে পেল। এরপর যুবতীরা কবির নিকট আহ্বারের দাবি জানালে কবি স্বীয় বাহন উটকে জবাই করে সবাইকে খাওয়ালেন। দিনশেষে প্রত্যাবর্তনের সময় বাহনহারা কবি দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সুযোগ কাজে লাগাতে জোর করে ‘উনাইযাহর উটের হাওদায় ঢুকে পড়লেন। ‘উনাইযাহর আপত্তি সত্ত্বেও একই উটের পিঠে একই হাওদায় আনন্দিত চিন্তে পথ অতিবাহিত করতে লাগলেন কবি।

স্পষ্টত এটি বিরহের বিষাদমাখা কাহিনী নয়, বরং প্রণয়-রাজ্যে ব্যর্থতার পরিবর্তে একটি আত্মপ্রসাদের কাহিনী। তবে ‘উনাইযাহ্ কবির প্রেম প্রস্তাব মেনে নেয় নি সহজে। কারণ কবির ভবঘুরে জীবনের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। ‘দারাতু-জুল-জুল’-এ ‘উনাইযাহ্ ও তার বাস্কাবীদের জন্য স্বীয় উট জবাই করে বাহনহীন কবি যখন ‘উনাইযাহ্‌র উটের হাওদায় করে ফিরছিলেন তখনও সে কবিকে বার বার বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে বারবার :

কোথায় সেদিন, যেদিন প্রিয়র হাওদা-মাঝে বসনু গিয়ে,
বল্‌লো প্রিয়া, “যাও না নিপাত, চাও কি নিতে পায় হাঁটিয়ে ?”
বল্‌লো আরো, “টল্‌ছে গদি, সইবে না ভার এ- দু’জনার,
কয়েস প্রিয়, নেমেই পড় ; করবে যে খুন উটটি আমার।”^{১০}

‘উনাইযাহ্-র প্রতি কবি গভীর প্রেমাসক্ত ছিলেন। তার সান্নিধ্য পেতে কবি ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত ও অস্থির। কিন্তু তাকে পাওয়া কবির জন্য ছিল দূষ্কর। তার অনীহা ও বিদ্রোহ সত্ত্বেও অধীর প্রতীক্ষায় কবি সুযোগ খুঁজতে থাকেন সেই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সুযোগ কবি অর্জন করেন দারাতু-জুল-জুলে। কিন্তু এত সুযোগ পেয়েও কবি যত তার কাছে যেতে চেয়েছেন সে যেন তত বেশি তাকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছে। কবি তখন ‘উনাইযাহ্‌র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তার সুন্দরী, সুদর্শনা সখীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, যাদেরকে কবি ইতঃপূর্বে ইচ্ছা মত ভোগ করেছেন ইচ্ছা মতো। কবি তাদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

গর্ভবতী দুগ্ধবতী তোমার মতো ঢের রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু ভোগ করেছি ডেরাই পশি।
যখন শিশু উঠতো কৈদে মুড়িয়ে দিত অর্ধ দেহ
মত্ত-বিবশ আধেক তখন আমার নীচে নিঃসন্দেহে।”^{১১}

এখানে নারীর রূপ বর্ণনায় প্রকটিত হয়েছে তাদের শরীরী সৌন্দর্য । সে যুগে পুরুষেরা যে কোন গর্হিত কাজ করতে দ্বিধা করতনা । তারা পরস্পরী সম্মোগ করত আর তা নিয়ে আলঙ্কারিক ভাষায় কবিতা লিখত । অশ্লীল হলেও তা উপভোগ্য ।^{১২} আকর্ষণীয় এ চরণগুলোতে নারীরূপের চমৎকার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে । গর্ভবতী মহিলা এবং প্রসূতিদের কামভাব ও দৈহিক চাহিদা আগের মত সতেজ থাকেনা । গর্ভজাত সন্তানের প্রতি সহানুভূতি ও নতুন প্রজন্মের চিন্তা ক্রমশ দূরে ঠেলে দেয় পুরুষ সঙ্গ থেকে ।^{১৩} এমনকি প্রসূতিরও মগ্ন থাকে নিজেদের সন্তান পরিচর্যায় । আরবের এমনি গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী সুন্দরী মহিলাদের দেহসম্প্রদায়ের কথা বর্ণনা করে কবি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে কবি 'উনাইযাহর দাস্তিকতাকে চেয়েছেন ম্লান করে দিতে । অহংকার পরিত্যাগ করে কবির আহবানে সাড়া দিতে বলেছেন । এর পরেও 'উনাইযাহ কবির কামনাবাসনা পূরণ করেছিল বলে মনে হয় না । কবিও যেন ছাড়বার পাত্র নন । তার সম্মতি আদায়ের জন্য কবি 'ফাতিমা' নাম্নী তাঁর অন্য এক প্রণয়িনীর অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিলেন তাকে । ফাতিমা এক বালির টিলায় বাস করত । একদিন সে 'উনাইযার মত বৈঁকে বসেছিল ; কবিকে সে কিছুতেই সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে দিবেনা । কবি তখন অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছেন—

রোসো খানিক, লো ফাতিমা! থামাও তোমার ছিনালপনা,
নিদেন যদি ছিঁড়বে বাঁধন, সহজ-শোভন পথ ধরো না ।^{১৪}

এ যেন 'উনাইযার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের সতর্কবাণী । এ সতর্কবাণী শোনার পরেও সে কবির মনস্কামনা পূর্ণ করতে রাজি হয় নি । কবি তখন আবার তাঁর প্রণয়িনীর রূপ সৌন্দর্য এবং তার সাথে দুঃসাহসিক নৈশাভিসারের এক মনোজ্ঞ চিত্র তুলে ধরেছেন 'উনাইযার সামনে । গভীর রাতে কবি তাঁর প্রণয়িনীর সুরক্ষিত তাঁবুতে পাহারারত রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে নিয়ে সংগোপনে তাবু ত্যাগ করে যে আনন্দ উপভোগ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

উটপাখিনীর ডিম্ব সম সুরক্ষিতা যেই রূপসী,
প্রলম্বিত প্রণয় তাহার ভোগ করেছি খিমায় পশি ।^{১৫}

উটপাখি যখন ডিম পাড়ে, তখন কেউই ডিমের কাছে ঘেঁষতে পারে না । সে একে সারাক্ষণ পাহারা দিতে থাকে । তাছাড়া উটপাখির ডিম দেখতেও খুব সুন্দর । সৌন্দর্য ও সংরক্ষণ এই দুই দিক থেকে কবি তাঁর প্রেমসীকে উটপাখির ডিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন । কবি ফাতিমাকে নিয়ে রাত্রির গভীরে বহু দূরে বালুর টিলায় এসে যখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন তখন তিনি তার সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও কোমলতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন । কবি তাঁর প্রেমসীর সেই রূপ, বর্ণ ও শরীরী সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে । গৌরবর্ণ, কোমর পর্যন্ত বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশি, উর্ধ্বমুখী খোঁপা, 'জবী' নামক উপত্যকার কোমল কেঁচো কিংবা 'ইস্‌হল্'

বৃক্ষের নরম দাঁতনের মত আঙ্গুলগুলো সব কিছু ফাতিমাকে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করেছে আমাদের সামনে :

সুশ্ম-কোমর উজল-দেহ নিটোল সরু প্রিয়ার কায়া,
স্বচ্ছ-মুকুর বক্ষে প্রিয়ার মলিনতার নেইকো ছায়া।
অপূর্ব সে শুভ্র-হরিৎ মুক্তা হেন কান্তি তাহার,
মুক্তা যেন স্বচ্ছ পূত সলিল-মাঝে জন্ম যাহার।
ফেরায় যখন সলাজ আনন বিকাশ করি গন্ড-যুগল,
‘বজরা’ বনের বৎসা-মৃগীর নয়ন হানে প্রণয়-চপল।
কুরঙ্গিণীর মতই গ্রীবা দেখতে মন আর নয়ন-হারা,
উঠায় যখন স্বভঙ্গিমা কণ্ঠ তাহার ভূষণ-পরা।
খেজুর কাঁদির মতই ঘন কৃষ্ণ অলক অতুল শোভা,
লীলায়িত কটির পরে, আকুল করা হৃদয়লোভা।
শিখ তোলা চিকুররাশি উর্ধ্বমুখী প্রিয়ার মাথায়,
বিলম্বিত বেণীর ফণী বিলীন বিপুল কেশের তলায়।
উটের সরু লাগাম হেন চিকন তাহার নাজুক কটি,
খেজুর-ছায়ায় সিক্ত সতেজ, বংশ হেন চরণ দুটি।^{১৬}

কবি তাঁর প্রিয়াকে আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপনের জন্য কখনো তাকে শুধু রাত্রিবাস পরিয়েছেন। প্রেয়সীর অনুপম দেহের বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। মসৃণ দেহত্বক, উন্নত বক্ষ ও ক্ষীণ কটিদেশ নারী সৌন্দর্যেরই বহিঃপ্রকাশ। বিনুকের মধ্যে সুরক্ষিত মুক্তার সঙ্গে তুলনা করে কবি ফাতিমার নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিয়েছেন। সে অন্য কারো স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। খোঁপা, বেণী ও এলোকেশী এ তিন অবস্থার কথা বর্ণনা করে এখানে চুলের আধিক্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। চর্মনির্মিত উটের লাগামের মত সরু, মোলায়েম কোমর দুলিয়ে এবং বৃক্ষ-ছায়ায় সিক্ত, সতেজ ও পরিপুষ্ট বাঁশের নলের মত পায়ের গোছা হেলিয়ে ফাতিমার পদচারণা। অধিক বেলা পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন থাকা আর বিছানায় মেশক-রেণু ছড়িয়ে থাকার বর্ণনা তার ধনী, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের মেয়ে হওয়ার পরিচায়ক। তার প্রেমালোক প্রেম-সাগরে পথ-হারাদের দিয়ে থাকে পথের দিশা, যেমনিভাবে বনে সাধুর সাঁঝের বাতি পথিকদের পথ দেখায়। তার রূপবিভায় অতিশয় ধৈর্যশীল ব্যক্তিরোও অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে তার দিকে।

মুনির মতো মানীর নয়ন যার রূপেতে রইল বাঁধা,
সেই রূপসী দাঁড়ায় যখন লাগায় চোখে বিজলি ধাঁধা।^{১৭}

কবির জীবনে ফাতিমার মতো সুন্দরী প্রণয়িনীর আবির্ভাব সত্ত্বেও ‘উনাইয়ার প্রতি তিনি লুপ্ত। ‘উনাইয়াকে বিস্মৃত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তার প্রেমে পড়ে কবিকে বরণ করতে হচ্ছে অসহনীয় দুঃখ। এই বেদনার অবস্থা এমনই যে, দিনগুলো কোন প্রকারে

কেটে যায়, কিন্তু রাতগুলো আর কাটতে চায়না। এমন একটি বেদনা-বিধুর রাতকে লক্ষ্য করে অসহ্য যন্ত্রণায় কবি বলেন—

রে নিদারুণ দীঘল রাতি! আনো এবার উষার আলো,
কিন্তু বলো, সেই যে উষা, তোমার চেয়ে কিইবা ভালো।^{১৮}

এসব শুনে 'উনাইয়া যখন কিছুটা সহানুভূতিশীল তখন কবি তাকে পাওয়ার জন্য তার ভবঘুরে জীবন-যাপনের কাহিনী শুনিয়েছেন। তার চিন্তায় কবির নিঃস্ব, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় দিন কাটাবার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসবের পরেও 'উনাইয়াহ কবির প্রণয়-ডাকে সাড়া দিয়েছিল কিনা কবি তার বর্ণনা দেন নি, তবে উদ্ভূতপৃষ্ঠে একই হাওদার ভিতর কবির পাশাপাশি বসে প্রেমিকের অফুরন্ত প্রেমালাপ যে উৎসাহভরে শুনেছে তাতে মনে হয়েছে তার মন বিগলিত হয়েছিল। কবির মু'আল্লাকায় এ ঘটনাই পাঠকের হৃদয়কে দোলা দিয়ে যায়।^{১৯} ভবঘুরে কবি এভাবে সুখ খুঁজেছেন নারীর সংস্পর্শে। নারী যেন তাঁর কবিতার ক্ষেত্র। বাবা হুজর থেকে বিতাড়িত হয়ে কবি আশ্রয় খুঁজেছেন নারীর সান্নিধ্যে। তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সঙ্গে পেয়েছেন, তাদের অতৃপ্ত সুখ পানে মত্ত থেকেছেন। আবেগ, মমতা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রিয়তমাদের রূপে, গন্ধে ও যৌবনে বিভোর থেকেছেন। আর এসব প্রেয়সীর শৈল্পিক চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর মু'আল্লাকায় সুন্দর সুন্দর উপমার মাধ্যমে। তিনিই প্রথম নারীদের নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখেছেন, তাদেরকে উপমা দিয়েছেন হরিণের সঙ্গে।^{২০}

অপরদিকে নারী তারাফাহ-র মু'আল্লাকারও মূল প্রেরণা। প্রেয়সীর বিচ্ছেদ-বেদনা কবির জীবন-বোধের মূলেও অনুভূত হয়। কবি-প্রেয়সী "খাওলাহ"-র পরিত্যক্ত বাস্তবতা দেখে পূর্ব স্মৃতি স্মরণ করে বিরহ ব্যথায় কবি মুহ্যমান। প্রিয়ার বিদায়কালীন কাফেলার দৃশ্য এবং সেই কাফেলার অভ্যন্তরে কবি-প্রিয়ার মৃগীসদৃশ অনুপম রূপ প্রভৃতির বর্ণনা অত্যন্ত সজীব ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে। প্রিয়ার সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি বিচিত্র ধরনের উপমার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কবি বলতেন তাঁর জীবনে পূর্ণ করার মত মাত্র তিনটি কামনাই রয়েছে : তার একটি রক্তাভ মদিরা পান, দ্বিতীয়টি প্রাণ দিয়েও আতের সেবা এবং তৃতীয়টি প্রেয়সীকে একান্তে নিয়ে বাদলঘন দিন আনন্দে যাপন। কল্পনায় হলেও এছবি চিত্তাকর্ষক, এতে সন্দেহ নেই ; -

তৃতীয় কামনা মোর হ্রাস করা বাদলের দিন,
যাপি উচ্চ তাঁবু তলে লয়ে প্রিয়া লাজুক সৌখিন।^{২১}

প্রিয়তমা যেন কবির লেখনি-শক্তির উৎস। কবি তাঁর মু'আল্লাকায় কল্পনায় ভর করে চলে গেছেন প্রিয়ার কাছে। কখনও একাকী নির্জনে ঘুরে ঘুরে খুঁজেছেন প্রেয়সীকে। তাঁর কাসীদাহ-তে একথা স্পষ্ট হয় যে তিনি প্রিয়াকে তাঁর গণ্ডিতে ধরে রেখে দিতে চেয়েছেন। এখানে যেন তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।^{২২} প্রিয়তমার বাস্তবতা দর্শনে বিরহকাতর কবির মনের আয়নায় ভেসে ওঠে তাঁর প্রিয়ার চলে যাওয়ার দৃশ্য। অনবদ্য উপমার সঙ্গে কবি ব্যক্ত করেছেন সেই অনুভূতি :

‘খাওলা’ চলিয়া গেছে, ‘পরিত্যক্ত বাস্তভিটা’ তার,
 আজিও উজ্জ্বল হেথা, স্মৃতি চিহ্ন আমার প্রিয়ার।
 ‘সমদ’ কঙ্কর-ভূমে, সেই চিহ্ন আজো দেখা যায়,—
 করপুষ্টে লুপ্ত প্রায়, উষ্ণিসম রেখায়-রেখায়।^{২৩}

এসব স্মৃতিচারণ করতে করতে কবি তাঁর প্রিয়ার সৌন্দর্যের এক মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবির প্রিয়া খাওলা ছিল ‘মালিকীয়াহ’ গোত্রভুক্ত। এজন্য কবি তাকে ‘মালিকীয়াহ’ বলেও সম্বোধন করেছেন।^{২৪} কবি অভিনব শব্দ ও বিচিত্র উপমা ব্যবহার করে যেন তাঁর প্রিয়ার ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। এতে তাঁর প্রিয়তমার বর্ণনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে কবির প্রণয়ভাব ও দেহমিলনের আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলো নৈতিকতা বিবর্জিত ও অশ্লীল মনে হতে এ শব্দসমূহ প্রযুক্ত হয়েছে তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে। ইমরু‘উল কায়েসের মত কবি তাঁর বর্ণিত প্রিয়তমাও নিষ্কলুষ। তাকে কেউ স্পর্শ করেনি। তার হাসিতে যেন ঝরে পড়ে সূর্যের স্বচ্ছ আলো ! যেটা অনুপম, অমলিন। কোন কলঙ্কের ছাপ তাতে নেই। কবির ভাষায়—

সেই কাফেলাতে প্রিয়া,—কুরঙ্গিণী রক্তিম-অধরা,
 কুড়ায় বনের ফল, তুলি গ্রীবা মুক্তাহার-পরা।
 ত্যজি‘যূথ কুরঙ্গিনী একাকিনী সবুজ-কাননে,
 কুড়াতে বনের ফল ঢাকে দেহ পল্লব-বসনে।
 লালিম অধরপুটে, হাসি তার উঠেছে উথলি,
 বিকশিয়া দন্তরাজি ফোটা যেন ‘বারুনা’-র কলি।
 রবি-করোজ্জ্বল তায় ‘আসমদের’ মিসির মঞ্জুন,
 সদ্য সুনির্মল দন্ত করেনি ক চর্বণ কখন।
 সে মুখে ঢেলেছে যেন রবি তার কিরণ মাধুরী,
 অনুপম, অকলঙ্ক, অমলিন রূপ মরি ! মরি !^{২৫}

অভিসার লীলা সম্পন্ন করার জন্য কবি ক্ষিপ্ৰ গতিসম্পন্ন বাহন নিয়ে প্রিয়তমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন, এবং মিলনের মাধ্যমে পূর্ণ করতেন মনোবাসনা। তাঁর কবিতা সার্থক হওয়ার পিছনে এসব নারী চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মু‘আল্লাকায় বর্ণিত কাহিনীর চেয়ে কাহিনীর সাথে জড়িত নারীর কারণেই এটি হয়েছে কালোত্তীর্ণ। তাছাড়া কবির মু‘আল্লাকায় সেই সমস্ত সুন্দরী নর্তকীর উল্লেখ পাওয়া যায় যারা নাচের আসরে নাচতে নাচতে প্রদর্শন করতো দেহের সৌন্দর্য। প্রাচীন আরবে সে সময় বিভিন্ন আসর বসত, যেখানে মদ পরিবেশিত হত এবং নারীরা নেচে- গেয়ে সবাইকে আনন্দ দিত।^{২৬} সেসব নারীদের সৌন্দর্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু বর্ণনা কবি দিয়েছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। তাদের ভিতরের জামা হতো আঁটসাঁট এবং উপরে থাকতো ঢিলে-ঢালা

কুর্তা, কিন্তু বক্ষ থাকতো উন্মুক্ত। যারা ছন্দময় পদে ও সঙ্গীতে করুণ সুরের লহরী সৃষ্টি করতো। কবি বলেন—

নৃত্যের আসরে মম বন্ধু যেন তারকা-উজ্জ্বল,
সন্ধ্যা-নটী আসে নেমে রক্তবাস খচিত আঁচল;—
নগ্নবক্ষ কুর্তি তার, কমনীয় প্রত্যঙ্গ কোমল,
বন্ধুরা পরশ সুখে হয় বটে আনন্দ বিহ্বল।
যখনই তাহারে বলি, “এসো প্রিয়া শুনাও সঙ্গীত,”
ব্রীড়ানতা ছন্দোময়ী ধীরপদা হয় উপস্থিত।
সুরের লহরী উঠে কণ্ঠে তার করিয়া গুঞ্জন,
বসন্তে সন্তান হারা উদ্বীর্ণ সম করুণ কুজন।^{২৭}

কবির মু'আল্লাকায় আরেকজন নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে হলো মা'বাদ-কন্যা, কবির ভ্রাতৃপুত্রী। তাকে কবি তাঁর অন্তিম উপদেশ দিয়েছেন। এ অংশে কবি তাঁর আত্মচারিত বর্ণনা করেছেন। কবি অতীত বর্ণনা করে নিজের জীবনের স্মৃতিগুলো ধরে রাখতে চেয়েছেন। ভুলে যেতে চেয়েছেন দুঃখ ও বেদনা। শান্তির খোঁজে আশ্রয় নিয়েছেন নারীর। সেই চিত্র বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ও উপভোগ্যরূপে।

কবি যুহাইর ইব্ন আবী সুলমার মু'আল্লাকায় নারীর উল্লেখ অনেকটা গতানুগতিক। কবি তাঁর মু'আল্লাকাকে পরিচিত করাবার জন্য ইমরু'উল কায়েসের প্রতিষ্ঠিত ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন। প্রিয়া, পরিত্যক্ত বাস্তভিটা দর্শনে কবির প্রাচীন স্মৃতির জাগৃতি এবং সেই প্রসঙ্গে প্রিয়ার বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা— ইত্যাদি যেন ইমরু'উল কায়েসেরই অনুকরণ। মু'আল্লাকাহ রচনার রেওয়াজ অনুযায়ী কবির প্রেম-কাহিনী বর্ণনার প্রসঙ্গ কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা মাত্র। এর একটি কারণ যুহাইর ছিলেন ধর্মভীরু ; খোদা, হাশর, তাওযাফ প্রভৃতিতে অটুট আস্থা তাঁর কবিতায় স্পষ্ট।^{২৮} তবে কবির সার্থকতা হলো এসব প্রসঙ্গ অবলম্বনে নারীর শিল্পসম্মত বর্ণনার উপস্থাপন। দীর্ঘ কবিতার প্রথম ক'টি শ্লোকে তিনি প্রিয়তমা 'উম্মু 'আওফা'-র বর্ণনা দিয়েছেন। উম্মু 'আওফা কবি-প্রিয়ার বংশগত ডাক নাম।^{২৯} তিনি ছিলেন বনু আসাদ গোত্রের রমণী। কারো কারো মতে উম্মু 'আওফা ছিলেন কবির প্রথম স্ত্রীর নাম।^{৩০} তার বসবাস ছিল 'দাররাজ' ও 'মুতাসল্লাম' নামক দুটি পার্বত্য স্থানের মাঝখানে। দীর্ঘ বিশ বছর পর প্রিয়ার পরিত্যক্ত ভিটা প্রত্যক্ষ করে কবি বড়ো বেশি কাতর। প্রেমিকার কথা চিন্তা করে কবি কঁদেছেন। বিলাপ করেছেন অতীত জীবনের একটি অধ্যায়ের কথা স্মরণ করে। তিনি ভুলতে পারছেননা প্রিয়তমার সঙ্গে নিবিড় সেই অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো। তাই কবি প্রিয়তমার স্মৃতি তুলে ধরেছেন এভাবে—

এই কি নীরব জীর্ণ মলিন আবাস ভূমি 'উম্মে আফা'র
'দরাজ' 'মুতসল্লাম' মাঝে রিক্ত ভিটা আমার প্রিয়ার।
দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে আজ দাঁড়ানু হেথায় এসে,

চিনতে সে ঘর তাই পেরেছি দীর্ঘ ভাবা চিন্তা শেষে ।

আমার প্রিয়ার আবাস ছিল চিন্নু যখন নিঘাত এ ঠাঁই,

বলনু, “প্রিয়ার রিক্ত ভিটা ! তোমায় শুভ প্রভাত জানাই ।”^{৩১}

কবি দীর্ঘ বিশ বছর আগের প্রিয়তমার বিদায়কালীন মুহূর্তকে দৃশ্যময় পরিচর্যায় তাঁর কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রিয়া যাচ্ছেন হাওদায় চড়ে। যে সব হাওদায় রয়েছে আরো অনেক সুন্দরী রমণী। যাদেরকে কবি ছর বালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ হাওদাগুলো মূল্যবান রেশমী কাপড় ও পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা, যার পাড় রক্তের মত লাল। রঙিন সুশোভিত হাওদাগুলি যেন ‘শনকাইচ’ দানার মত দুর্লভ। ঐ সব মহিলা সাওয়ারীর নিতম্বে বসা। তাদের চেহারায় সুখ, শান্তি ও পরম বিলাসিতার ছাপ। এখানে কবি-প্রিয়ার এবং তার বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির প্রিয়া ছিলেন সুখ-শান্তিতে ভরা এক অভিজাত পরিবারের নারী।^{৩২} তার রূপের মনোরম ছবি সৌন্দর্য-পিপাসুদের তৃপ্ত করে :

বন্ধু মম, লক্ষ্য কর ‘হাওদা-নশীন’ ছর বালারা,

‘জুর্সুমে’র ঐ উপর দিয়ে সেদিক পানে যায় কি তারা ?

ঝলসে তাদের দেহের পরে ‘বেশ-কিমতী’ পশমী বসন,

মিহিন পাতল ‘নেকাব’ উড়ে আঁচল রঙীন রক্ত বরণ।

উর্ধ্বদিকে ‘সুবান’ পানে নিতম্বেতে আসন পাতি,

লীলায়িত লাস্যময়ী চলছে লাজুক ছন্দে মাতি।

সেই শোভাতে আকুল পরাণ রূপ-জহরীর লাগায় নেশা,

সে রূপ-সুধায় চাতক নয়ন আড় নয়নে মিটায় তৃষা।^{৩৩}

প্রিয়তমার এসব স্মৃতি কবির মু’আল্লাকাকে প্রাণ দিয়েছে। নিঃসঙ্গ জীবন-তীরে দাঁড়িয়ে কবি প্রিয়ার বিদায় কাফেলার স্মৃতি স্মরণ করে অনুপম ভাষায় প্রিয়া ও তার সঙ্গীদের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

কবি লাবীদ ইব্ন রাবী‘আহ তাঁর মু’আল্লাকায় নারীর বর্ণনায় অন্যদের তুলনায় অনেকাংশে স্বতন্ত্র। দীর্ঘজীবী এ কবি ছিলেন বাস্তববাদী। কবিতায় তিনি বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন ; চলে গেছেন তাঁর প্রিয়া নাওয়ারের কাছে। গতানুগতিক ধারায় কবি তাঁর প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তবজীবনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং দেশজ ও লোকজ শব্দ ব্যবহার করে কিছুটা ভিন্ন মাত্রায় প্রিয়ার পরিত্যক্ত অঙ্গনের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন :

লুণ্ড আবাস-চিহ্ন আজি, ক্ষণস্থায়ী, দীর্ঘকালীন;

এই সে ‘মিনা’ ‘গুল-রিজামে’ বাস্তবজীবী তাদের বিলীন।

কোন্ অতীতে হেথায় ছিল আমার প্রিয়ার রিক্ত গেহ,

বছর পরে বছর গেছে আজ তাহারা নাইকো কেহ।^{৩৪}

তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ‘গুল’ ও ‘রিজাম’ নামক পাহাড় দুটির মাঝে অবস্থিত তাঁর প্রিয়ার বাস্তবজীবনের দৃশ্য দেখছেন আর বর্ণনা দিচ্ছেন অতীত কাহিনীগুলোর। তিনি তাঁর

প্রিয়তমার জন্য কাঁদছেন, সাথে তাঁর বন্ধুরাও কাঁদছে। তিনি অনুভূতি দিয়ে স্মরণ করছেন নাওয়ারকে। বিষাদ ও হতাশাকে সঙ্গী করে শোক করছেন প্রিয়ার জন্যে -

দাঁড়িয়ে গেলাম অঙ্গনে তার, প্রিয়ার ব্যথায় হৃদয় ভোবা,
শুধাই করে, পাষানগুলি, কয়না কথা নিখর বোবা।^{৩৫}

কবি প্রিয়ার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন প্রিয়তমার বিদায়দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে। এ বর্ণনায় তিনি নতুন নতুন শব্দ ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, যা মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি বন্য প্রাণী, বৃক্ষ প্রভৃতির সঙ্গে প্রেমিকাকে তুলনা করেছেন। কবি বলেছেন লাল পর্দাঘেরা হাওদার মাঝে তাঁর প্রিয়া যেন ‘বজরা’র বৎসা-গাভী আর প্রণয় ভরা হরিণীর মত। তার বাহনগুলো যেন গিরির বাঁকে ঝাউয়ের বীথি :

বিদায়-রথে সেই কাফেলা হানলো আঁখি আকুল-করা,
‘তুজি’ ‘বজরা’র বৎসা-গাভী, আর হরিণী প্রণয়ভরা।^{৩৬}

কবি প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা অভিমানী, জেদী। প্রিয়া-বিচ্ছেদ জনিত অভিমানের বর্ণনায় মু‘আল্লাকার অন্যান্য কবিদের তুলনায় তাঁর বর্ণনা অধিকতর বিক্ষুব্ধ। তিনি প্রেমের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে রাখতে চান। তবে অকস্মাৎ যদি সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কবির তাতে কোন দুঃখ নেই। লাবীদের দৃষ্টিতে প্রেমের বন্ধন যখন শিথিল হয়, তখন অবলীলাক্রমে সেই বন্ধন ছিন্ন করাই প্রকৃত প্রেমের আদর্শ। তাই তিনি বলেন-

টুটাও বাঁধন তাহার সাথে ব্যর্থ যাহার মিলন আশা,
বিফল প্রেমের নেইকো আশা প্রেমিক বটে সেইতো খাসা।^{৩৭}

কবির প্রেয়সী ছিল আরবের প্রসিদ্ধ ‘মুররা’ গ্রামের অধিবাসিনী। পরে সেখান থেকে আরবের প্রধান প্রদেশ ‘হিজাজ’-এ গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল।^{৩৮} তাই প্রিয়া-হারা কবি হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত দিনগুলোর কথা। যখন রাত্রিগুলো মদের আসরে কাটিয়ে দিয়েছেন। সেখানে থাকতো সিতার হাতে সুন্দরী গায়িকা। যাদের আঙ্গুলের স্পর্শে কবির হৃদয় ভরে যেত। সেসব নারীর বর্ণনা এসেছে এভাবে-

কাটিয়ে দিছি রাত্রি কতই কিসসা বলে আসর করে,
ভাঙিখানায় উড়তো নিশান নিতাম যে মদ অগ্নি দরে।
কতোই উষার স্বচ্ছ-সুরা, আর গায়িকা সিতার হাতে,
ঢালতো সুধা হৃদয় মাঝে প্রিয়ার আঙ্গুল পরশ ঘাতে।^{৩৯}

কবি ‘আমর ইব্ন কুলসুম-এর মু‘আল্লাকায় নারীর উপস্থাপন অনেকটা স্বতন্ত্র। নারীর বর্ণনায় তিনি নতুনত্ব এনেছেন। এতে তাঁর হৃদয়ের, ইচ্ছার ও বুদ্ধির স্পর্শ ফুটে উঠেছে। মু‘আল্লাকার ভূমিকায় তিনি গতানুগতিক বিচ্ছেদ বর্ণনা করেন নি। এখানে বিচ্ছেদ গৌণ এবং মিলন মুখ্য। কবির প্রেয়সী উম্মু ‘আমরের বিদায়ের পূর্বে কবির সাথে যে মধুর মিলন হল তার উপভোগ্য বর্ণনা তুলে ধরেছেন তিনি। ইতঃপূর্বে কবির প্রিয়া বিভিন্ন আসরে মদ পরিবেশনসহ বিভিন্নভাবে বহুবার কবিকে আনন্দ দিয়েছে।

বিচ্ছেদের প্রাক-পর্যায়ের মিলন মুহূর্তে কবি তাঁর প্রেয়সীকে মদ পরিবেশনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এভাবে –

ওঠো সখি ! দাওগো শরাব বিরাট তোমার পাত্র ভরি,
আন্দরীনের মধুর শরাব কাহার লাগি রাখবে ধরি।
উম্মে ‘আমর ! সে তিন জনা যাদের তুমি দিচ্ছ শরাব,
দুর্ভাগা এ বন্ধু তোমার তাদের চেয়ে কিইবা খারাপ।^{৪০}

প্রেমিকের বিরহকালীন হাহতাশ ও দীর্ঘশ্বাসে কোন নতুনত্ব নেই। কবির কাছে বিরহ-পরবর্তী মিলন যেমন অনুভূতিঘন ও মধুর, বিরহ-পূর্ববর্তী মিলন-কালও তেমনি অনাবিল আনন্দঘন। এজন্য কবি বিদায়ের সময়ও তাঁর প্রিয়াকে বাহন থামানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। প্রিয়ার হৃদয় উজাড় করে দেয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। উম্মু ‘আমর আজ কবির সঙ্গে প্রতারণা করে চলে যাচ্ছে। এজন্য কবি তাকে সেই সুদিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে দিনগুলোতে তাঁর অস্ত্র কুশল ও যোগ্যতা প্রিয়ার পরিবার ও ভ্রাতৃ-স্বজনদের মন জুড়িয়েছিল। কবি প্রিয়াকে লক্ষ্য করে বলেন –

তাই বিদায়ের পূর্বে খানিক থামাও তোমার বাহন প্রিয়া,
মনের কথা জানাই তোমায় উজাড় করো তোমার হিয়া।
সেই সময়ের দারুন দিনে তোমার জ্ঞাতি ভ্রাতৃ-স্বজন,
দেখে আমার অস্ত্র কুশল জুড়িয়েছিল তাদের নয়ন।^{৪১}

মু’আল্লাকার অন্যান্য কবিদের মত তিনি প্রিয়ার বাস্তবতার বর্ণনা দেননি। তবে প্রিয়ার শরীরী সৌন্দর্যের নান্দনিক বর্ণনা দিয়েছেন। আর এ বর্ণনা দিতে কবি পশু পাখি থেকে সুন্দর সুন্দর চিত্রকল্প ধার করেছেন। প্রিয়ার বাহকে কবি বক্ষ্যা-উটের জঙ্ঘা যুগলের সাথে তুলনা করেছেন। হাতির দাঁতের নির্মিত কৌটার সাথে তুলনা করেছেন তার বুককে, যা কেউ স্পর্শ করেনি। তার মাংসাল নিতম্ব এবং নূপুর-শোভিত পা দু খানি উন্মাতাল করে তোলে কবিকে। কবি বলেন–

আমার প্রিয়ার যুগল বাহু দীর্ঘ নিটোল শুভ্র উজল,
কণ্ঠ-দরাজ শুভ্র সতেজ, বক্ষ্যা-উটের জঙ্ঘা যুগল।
হস্তি-দাঁতের কৌটা যেন যুগল কলি বক্ষোপরি,
কোমল; তা’তে কেউ করেনি স্পর্শ কভু হায়রে মরি !
দেখবে তুমি আমার প্রিয়া দীর্ঘ কোমল জঙ্ঘা তারি,
মাংস ভারে চলন ধীরে নিতম্ব তার এমনি ভারী।^{৪২}

এমন সুন্দরী প্রিয়ার বিদায়ে কবি স্বভাবত ব্যাকুল। শাবক-হারা উষ্ট্রী এবং সন্তান-হারা বৃদ্ধার মত কবি এক বুক ব্যথা নিয়ে তাই ছুটে যান প্রিয়ার কাছে। কবি বলছেন–

নতুন করে প্রিয়ার স্মৃতি, জাগলো সেদিন হৃদয় মেলা,
উষ্ট্রী প্রিয়া হাঁকিয়ে নিয়ে চললো যেদিন সাঁঝের বেলা।^{৪৩}

কবি প্রেয়সীর বর্ণনা শেষে নিজ গোত্রের শৌর্য-বীরত্ব, মান-মহিমা ও তাদের বীরত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর মু'আল্লাকায়। এ প্রসঙ্গে কবি স্বগোষ্ঠীয়-রমণীদের বর্ণনা এনেছেন। যে সব রমণী সুন্দরী, বীরঙ্গনা। যাদের শরীরের নান্দনিক গঠন মদের নেশায় মাতাল ব্যক্তির মত টলটলায়মান। তাঁরা অভিজাত বংশের মেয়ে। যুদ্ধের ময়দানে পুরুষের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে যাতে অপমানিত হতে না হয় সৈজন্য তারা নিজ নিজ স্বামীকে উৎসাহ যোগায়। শপথ নেয় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার। পরাজিত হলে স্বামীকে ত্যাগ করার ঘোষণা দেয়। সেই সব নারীদের রক্ষার জন্য তাদের স্বামীরা বীর-বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরবারির আঘাতে শত্রুসেনাদের মাথা উড়িয়ে দেয়। জাহেলি যুগে নারীদের কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ছিলনা। তারা শুধু ছিল ভোগ-বিলাসের পাত্র।^{৪৪} তবে নারীর স্থান ও মর্যাদা যাই থাকুক না কেন মাতা, বোন, জায়া ও প্রেমিকাক্রমে সমাজের উপর তাদের প্রভাব ছিল বেশ জোরালো। এদের সম্মান রক্ষায় পুরুষেরা প্রাণ বিসর্জন করতেও দ্বিধা করতনা। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পরাজিত হয়ে ফিরে আসলে সন্তান, ভাই ও স্বামীরূপে স্বীকৃতি লাভের আশা হতেও তাদের বঞ্চিত হবার আশঙ্কা পোষণ করতে হত। তাই পুরুষেরা নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরণ যুদ্ধ করতেও কুণ্ঠিত হত না। তেমনি কবি এবং তাঁর গোত্রের পুরুষেরা তাঁদের রানীদের শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে সেসব নারীও ক্লান্ত অশ্বগুলোকে সহ্যতনে খাবার খাওয়ায়। কবি বলেন –

জশম কুলের সেই ললনা রণাঙ্গনে বীরঙ্গনা,
যেমনি তারা কুল-কামিনী তেমনি নীতি ধর্মমনা।
রণশান্ত অশ্ব মুখে যোগায় দানা যত্ন করে,
বলে, “স্বামী নও তোমরা শত্রু যদি মোদের হরে।”^{৪৫}

কবি ‘আনতারা হ ইব্ন শাদ্দাদ তাঁর মু'আল্লাকায় একসঙ্গে প্রেম ও যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে এখানে তাঁকে যোদ্ধার চেয়েও খাঁটি প্রেমিক মনে হয়। প্রিয়ার বর্ণনা নিয়ে তিনি আমাদের কাছে হাজির হয়েছেন। কবি তাঁর চাচাতো বোন ‘আব্বা’কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাকে ছাড়া তিনি অন্য আর কাউকে ভালবাসেন না।^{৪৬} সেকালের আরব রীতি অনুসারে কন্যাদের বিবাহের বেলায় চাচাতো ভাইদের দাবি ছিল অগ্রগণ্য। সেই দাবীতে কবি ‘আব্বাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দাসীর পুত্র বলে তাঁর এই পরিণয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। এই রচনা তাঁর হৃদয়ে রেখাপাত করে। মু'আল্লাকার রীতি অনুযায়ী তিনি প্রিয়া ‘আব্বার পরিত্যক্ত বাস্তবিক দর্শনে বিরহ ব্যথায় কাতর হয়েছেন। প্রিয়ার শূন্য আবাসভূমি আজ নীরব দাঁড়িয়ে আছে। কবি তাকে অভিবাচন জানাচ্ছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রিয়ার বিচ্ছেদ ব্যথায় কাঁদছেন। কবি বলেন—

হে ‘আব্বার’ রিক্ত আবাস ! কওনা কথা আমার সাথে,
লওগো আমার প্রাণের আশিস্ রিক্ত প্রাণের এই প্রভাতে।^{৪৭}

কবি প্রিয়ার প্রণয় আশায় ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু সে আশা যেন আজ সুদূর পরাহত। কারণ তাঁর প্রিয়া আজ অনেক দূরে চলে গেছে। তাই কবি আজ প্রিয়ার বাস্তু-ত্যাগের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। কবি যেন তাঁর প্রিয়াকে স্বচক্ষে দেখছেন। বর্ণনা দিচ্ছেন প্রিয়ার রূপের। কবির প্রিয়া সলাজ কষ্ঠ, যুগলনয়ন ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারিণী। তার দাঁতগুলো সুরু ও উজ্জ্বল-বরণ। মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মেশকের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। কবি-প্রিয়া যেন বৃষ্টির পানিতে সদ্য গজিয়ে ওঠা সবুজ সতেজ বৃক্ষ, যাকে কেউ স্পর্শ করে নি। তাতে নেই কোন মলিনতার ছাপ। তার স্পর্শে অলিকূল সুরের ঝংকার তোলে। কবি বলেন –

পড়ছে মনে প্রিয়ার সুরু উজল বরণ দন্তরাজি,
সিক্ত সুধায় অধর-যুগল, প্রিয়ার মনে পড়ছে আজি।
কিংবা ঘন বাদল ধারায় শ্যামল বীথি গজিয়ে ওঠা,
নেই তাহাতে চিহ্ন পায়ের, মলিনতার একটা ফোঁটা।
নিবিড় ঘন সেই বীথিতে গুঞ্জে মিহি কণ্ঠে অলি,
শরাব নেশায় মত্ত বিভোর কণ্ঠে যেন সুরের কলি।^{৪৭}

কবির প্রিয়া বিলাসী। সে সারাক্ষণ কোমল শয্যার ওপর কাটিয়ে দেয়। কণ্ঠের ছাপ তাকে স্পর্শ করে না, পক্ষান্তরে ব্যথাতুর কবির দিন-রাত্রি কেটে যায় ঘোড়ার পিঠে পিঠে। প্রিয়া যখন কবির প্রণয় আহ্বান এড়িয়ে যেতে চেয়েছে কবি তাকে আবেদন করেছেন এড়িয়ে না যাওয়ার, সহজে কবির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার। কবি নিজের মান-মহিমা প্রিয়াকে গুনিয়েছেন। নিজের শৌর্য-বীর্য ও অতীত ভোগ-বিলাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রিয়াকে সতর্ক করেছেন-

হে ‘আবালা’! মালেক সূতা নাই যদি বা ছিলই জানা,
সৈন্যগণে শুধাওনি হায় কেন তবে সেই ঘটনা।^{৪৮}

এতকিছু শুনার পরও কবির প্রিয়া তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় নি। কবি এ প্রসঙ্গে খেদোক্তি করেছেন। হতাশা ব্যক্ত করেছেন আপন মনে। এখানে কবি আরেকজন নারীর উল্লেখ করেছেন। সে হচ্ছে কবির দাসী। যাকে কবি তাঁর প্রিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন গোপনে তার খবর নিতে। কবি প্রেয়সীর সঙ্গে মধুর মিলনকে স্মরণ করেছেন প্রিয়ার রূপের বর্ণনার মাধ্যমে –

প্রিয়ার সাথে সেই সে দেখা মধুর বটে ভঙ্গী গ্রীবার
মৃগ-শিশুর কষ্ঠ যেন ফোটক নাকে ওঠে তাহার।^{৪৯}

সপ্তম মু’আল্লাকার রচয়িতা কবি হারিস ইবন হিল্লিয়াহ্ প্রিয়তমা ‘আসমার বিরহ-ব্যথা নিয়ে তাঁর মু’আল্লাকাহ্ গুরু করেছেন। প্রিয়ার বিরহের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি দুঃখ বেদনায় কঁদেছেন, প্রিয়াকে অবিরাম অনুসরণ করেছেন, এবং চলে গেছেন প্রেয়সীর বাস্তুভিটার কাছে। প্রকৃতির রূপ নিয়ে তিনি প্রিয়ার পরিত্যক্ত ভিটার বর্ণনা দিয়েছেন। বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর কবি বলেন—

‘আসমা’ প্রেয়সী মোর, বিদায়ের জানালো খবর,
কতজন পীড়া দেয়, কাছে যারা থাকে নিরন্তর।
আমারে জানিয়েছিল, তার পর গেল প্রিয়া চলি,
আর কবে দেখা হবে বেদনায়, তাই সদা জুলি।^{৫১}

তবে কবিতাটি যেহেতু হীরাহ্ অধিপতি ‘আমর ইবন হিন্দ এর দরবারে কবি প্রণয়ন করেছেন তাই এখানে নারীর বর্ণনা অন্যান্য মু‘আল্লাকার মত হয় নি। অনেকটা যেন শুধু আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করেছেন তিনি। এজন্য কবি তাঁর কবিতায় প্রিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে। কবি প্রিয়ার সাথে দেখা করেছেন সমমার কাকর-প্রান্তে, খালসায়, মহিয়ায়। কখনো ফিতাকের গিরির চূড়ায়, আজিবে, ওফায়, রিয়াজুল কাতায়, শোরিবের ঘাটির ছায়ায়। কখনোবা সুবাতানে এবং আবলায়। এভাবে স্থানে স্থানে কবি প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে দেখা নেই। এজন্য কবি আক্ষেপ করে বলেছেন—

আজ তার নেই দেখা এত দেখা ছিল যার সনে
অঝোরে ঝরিছে অশ্রু কিন্তু বৃথা, আজ সে রোদনে।
‘আকীকা’ শখসিন্-মাঝে জেলেছিল অগ্নি মোর প্রিয়া,
সুগন্ধি অগুরু কাঠে সমুজ্জ্বল উষা আলোকিয়া।^{৫২}

এরপর কবি কিছুটা প্রশান্তি পাবার আশায় প্রিয়ার সঙ্গে অভিসারের কথা স্মরণ করেছেন। কবি ক্ষিপ্ৰগতি সম্পন্ন উট নিয়ে দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যেতেন প্রিয়ার কাছে। সে উটের বর্ণনা এবং যাত্রাপথের বর্ণনা তাঁর প্রেয়সীর চিত্রকে পরিস্ফুট করেছে। নারীর বর্ণনা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে মু‘আল্লাকায় স্থান।

মু‘আল্লাকাতে নারীর উপস্থিতি চির ভাস্বর ও সর্বকালীন। প্রেমিকার কাছে দীর্ঘ-দিনের সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রেমিকার রূপের বর্ণনা, বৈশিষ্ট্য, স্বভাব-চরিত্র, ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রভৃতি উল্লেখের মাধ্যমে। কবির তাঁদের কবিতায় সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রিয়তমাকে নিয়ে। নিজেকে কল্পনার সাগরে ভাসিয়ে প্রিয়তমার সান্নিধ্য পাবার কামনা করেছেন। আজ আমরা যাকে রোমান্টিক কবিতা বলছি সেই ধারাটির সুর ধ্বনিত হয়েছিল বহু শতাব্দী আগে প্রাচীন আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ‘আল-মু‘আল্লাকাত’ কাব্যমালায়। এসব বর্ণনায় আছে বেদনা, দুঃখ, হতাশা, আছে বিরহকাতরতা। পাশাপাশি ভোগ-বিলাস ও প্রণয়-উন্মত্ততার সুন্দর দৃষ্টান্ত। যার মাধ্যমে প্রাচীন আরব সমাজের চিত্র, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতি, বিজ্ঞতা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।^{৫৩} এর কবিদল কখনও কেঁদেছেন, কখনও বিরহ ব্যথায় কাতর হয়েছেন। কখনও যুদ্ধের বিভীষিকা ভুলে যেতে নির্জনে প্রেমিকার সান্নিধ্যে চলে গেছেন ; মগ্ন থেকেছেন নেশায় ও মদ্যপানে। সেই স্মৃতি স্মরণ করে অঙ্কন করেছেন নারীর রূপসৌন্দর্য এবং বিচিত্র চালচিত্র ; যে চিত্র কবিতার অবয়বকে করেছে প্রসন্ন ও প্রদীপ্ত।

তথ্যপঞ্জি :

১. আরবি মু’আল্লাকাত শব্দটি ‘ইলক ধাতু থেকে নির্গত। ‘ইলক অর্থ মূল্যবান বস্তু, ক্রিয়াপদে এর অর্থ টাঙ্গানো, ঝুলানো ; রূপক অর্থে সেই দামী বস্তু যা পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। জাহেলী আরবি সাহিত্যের সাত বা দশটি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতাকে মু’আল্লাকাত বলা হয় যেগুলো পবিত্র কাবা গৃহে টাঙ্গানো হয়েছিল এবং সকলের নিকট সমাদৃত ছিল। (আ.ত.ম.মুহলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪৮। ড. মাহমুদ হামদী যাকযুক, *আল-মাউসু’আত আল-ইসলামিয়াহ আল-‘আম্মাহ*, কায়রো, ২০০৩, পৃ. ১৩২৬। Nicholson, *A Literary History of the Arabs*. Canbridge. London, 1979, P. 101)
২. ডঃ মোঃ ছালেহ আল-শানতী, *ফি আল-আদাব আল্ আরাবী আল্-কাদীম*, দারুল আন্দালুস, সৌদী আরব, ১৯৯২, পৃ. ৮০
৩. প্রাচীন আরবি কবিতা দুই প্রকার- কাসীদা বা দীর্ঘ কবিতা ও কিত’আ বা খণ্ড কবিতা। কাসীদা আরবি কসদ ধাতু থেকে নির্গত, অর্থ হলো উদ্দেশ্য, সংকল্প। কবির ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে এ কবিতায় প্রকাশিত হয় বলে এটি কাসীদা। কাসীদায় সাধারণত পঁচিশ থেকে একশত পর্যন্ত শ্লোক থাকে। মু’আল্লাকাত দীর্ঘ কবিতা বা কাসীদার অন্তর্ভুক্ত। (আ.ত.ম.মুহলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪৫। *আল-মাউসু’আত আল-ইসলামিয়াহ আল-‘আম্মাহ*, ড.মাহমুদ হামদী যাকযুক, কায়রো, ২০০৩, পৃ. ১১৪৪।)
৪. রোমান্টিসিজম হলো শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারা বা আন্দোলন যা ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের পর ইংল্যান্ডে বিকাশ লাভ করে। যার মূল সুর হচ্ছে কবিতায় কল্পনার প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেয়া। প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন, বুদ্ধির উপরে ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রাধান্য এবং ১৮ শতকের যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি নানাভাবেও এর সংজ্ঞা দেয়া হয়ে থাকে। (ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস*, ফ্রেডস বুক কর্পার, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৬। বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্থ খণ্ড, প্রধান সম্পাদক, খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৩২৭-২৮)

৫. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৭
৬. প্রেমের কবিতা রচনা করাকে তাশবীব বলা হয়। কাসীদার প্রথম অংশে প্রণয় সংক্রান্ত বর্ণনা থাকায় এ অংশকে তাশবীব বা প্রেমোদ্দীপক ভূমিকা বলে। (আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৬)
৭. ইকবাল শাইলো, *সপ্ত বুলন্ত গীতিকায় রোমান্সিজম*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৪
৮. ইমরু'উল কায়েস, মু'আল্লাকাহ, শ্লোক- ৮-৯, অনু- নূরুদ্দীন আহমদ, আস্‌সবউল মু'আল্লাকাত, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৮৪
৯. হান্না আল ফাখুরী, *তারীখ আল- আদাব আল- আরাবী*, আল-মাত বা 'আতুল বুলসিয়াহ, বৈরুত, পৃ. ৮২
১০. ইমরু'উল কায়েস, মু'আল্লাকাহ, শ্লোক-১৩-১৪, অনু-নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৪
১১. ঐ, শ্লোক-১৬-১৭, পৃ. ৮৪
১২. আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৩
১৩. ইকবাল শাইলো, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৩
১৪. ইমরু'উল কায়েস, মু'আল্লাকাহ, শ্লোক-১৯, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৫
১৫. ঐ, শ্লোক -২৩, পৃ. ৮৬
১৬. ঐ, শ্লোক -৩১-৩৭, পৃ. ৮৭
১৭. ঐ, শ্লোক-৪১, পৃ. ৮৮
১৮. ঐ, শ্লোক-৪৬, পৃ. ৮৮
১৯. আহমাদ হাসান আল-যায্যাত, *তারীখুল আদাব আল-আরবী*, পৃ. ৪৮
২০. ঐ, পৃ. ৪৮
২১. তারাফাহ, মু'আল্লাকাহ, শ্লোক- ৬১, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১১
২২. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, Cambridge, London, 1979, P. 108
২৩. তারাফাহ, মু'আল্লাকাহ, শ্লোক- ০১, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৮

২৪. নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৯
২৫. তারাকাহ, মু‘আল্লাকাহ, শ্লোক-৬-১০, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০১
২৬. Hitti, *History of the Arabs*, London, 1972, p. 94
২৭. তারাকাহ, মু‘আল্লাকাহ, শ্লোক-৪৯-৫২, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৯
২৮. আহমাদ হাসান আল-যায়াত, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫২
২৯. নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৮
৩০. ইকবাল শাইলো, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭৫
৩১. যুহাইর ইব্ন আবী সুলমা, মু‘আল্লাকাহ, শ্লোক ১, ৪, ৬ ; অনু- নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৮, ১২৯
৩২. আবু আব্দুল্লাহ আল-যুযনী, *শরহুল মু‘আল্লাকাত আল-সাব‘ই*, পৃ. ৬১
৩৩. যুহাইর ইব্ন আবী সুলমা, মু‘আল্লাকাহ, শ্লোক- ৭-৯, ১১, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৯, ১৩০
৩৪. লাবীদ ইব্ন রবী‘আহ্, মু‘আল্লাকাহ, শ্লোক- ১, ৩, অনু-নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৯, ১৫০
৩৫. ঐ, শ্লোক- ১০, পৃ. ১৫১
৩৬. ঐ, শ্লোক- ১৪, পৃ. ১৫২
৩৭. ঐ, শ্লোক- ২০, পৃ. ১৫৩
৩৮. ইবনুন নুহাস, *শরহুল কাসায়েদ আল-মাশহুরাত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ*, বাইরুত, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৮
৩৯. লাবীদ ইব্ন রবী‘আহ্, মু‘আল্লাকাহ, শ্লোক- ৫৮, ৬০, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৬০
৪০. ‘আমর ইব্ন কুলসূম, মু‘আল্লাকাহ, শ্লোক- ১, ৬, অনু- নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭৬
৪১. ঐ, শ্লোক- ৯, ১১, পৃ. ১৭৭
৪২. ঐ, শ্লোক-১৪-১৬, পৃ. ১৭৮
৪৩. ঐ, শ্লোক-২১, পৃ. ১৭৯

৪৪. ড. মোঃ বুয়ুমী মাহরান, *দিরাসাত ফি তারিখ আল-আরব আল-কাদিম*, দাবুল মা'রিফা আল-জামিইয়া, মিসর, ১৯৯৮, পৃ. ৪৬
৪৫. 'আমর ইব্ন কুলসুম, *মু'আল্লাকাহ*, শ্লোক-৮৭, ৮৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৪৬. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৪৭. 'আনতারাহ ইব্ন শাদ্দাদ, *মু'আল্লাকাহ*, শ্লোক-৪, অনু- নূরুদ্দীন আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
৪৮. ঐ, শ্লোক- ১৬, ১৮, ২১, পৃ. ২০৩, ২০৪
৪৯. ঐ, শ্লোক- ৪৭, পৃ. ২০৯
৫০. ঐ, শ্লোক-৬৫, পৃ. ২১২
৫১. হারিস ইব্ন হিল্লিয়াহ্ , *মু'আল্লাকাহ*, শ্লোক-১-২, অনু- নূরুদ্দীন আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৫২. ঐ, শ্লোক- ৬, ৯, পৃ. ২২৩
৫৩. ড. মোঃ বুয়ুমী মাহরান, *দিরাসাত ফি তারিখ আল-আরব আল-কাদিম*, দাবুল মা'রিফা আল-জামিই'য়া, মিসর, ১৯৯৮, পৃ. ৪৭